HSB

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ৫ • সংখ্যা ৩ • সেপ্টেম্বর ২০০৭
আইএসএসএন ১৭২৯-৩৪৩এক্স

ভেতরের পাতায়

পৃষ্ঠা ৬

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদী কাশিতে ভোগা প্রাপ্তবয়স্কদের চিকিৎসাসেবা গ্রহণের ধরন এবং বেসরকারি চিকিৎসকগণ (প্রাইভেট প্রাকটিশনার)-কর্তৃক তাঁদের ব্যবস্থাপনা

পৃষ্ঠা ১৩

গর্ভাবস্থায় মা আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করলে তাতে কি সন্তানের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়?

পৃষ্ঠা ১৮

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

২০০৭-এর বন্যা মোকাবেলা: আইসিডিডিআর,বির ঢাকা হাসপাতালে রেকর্ডসংখ্যক রোগীর চিকিৎসাসেবা গ্রহণ

এই গ্রীষ্মে প্রবল মওসুমী বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট বন্যায় বাংলাদেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ-ধরনের বন্যার সাথে পানিবাহিত রোগসমূহের ব্যাপক প্রাদুর্ভাবের সম্পর্ক রয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর সেবা এবং চিকিৎসার জন্য বিশেষায়িত আইসিডিডিআর,বির ঢাকা হাসপাতালে (যা মহাখালী কলেরা হাসপাতাল নামে অধিক পরিচিত) আগস্ট মাসে রেকর্ড সংখ্যক ২১,৪০১ জন রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে। এ-সব রোগীর ৭০% মারাত্মক পানিশূন্যতা নিয়ে হাসপাতালে এলেও ডায়রিয়া অথবা পানিশূন্যতাজনিত কারণে এ-সময়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একজন রোগীও মারা যায় নি। হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা যখন সর্বোচ্চ, তখন দৈবচয়নের ভিত্তিতে শতকরা দু'জন রোগীকে পরীক্ষা করে ৩৫% রোগীকে কলেরায় এবং ১২% রোগীকে রোটাভাইরাসে আক্রান্ত দেখা গেছে। *ভিব্রিও কলেরি* জীবাণুর যেসব প্রজাতি নির্ণীত হয়েছিলো সেগুলো রোগ-সৃষ্টির জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী (ভিরুলেন্ট) ছিলো। মারাত্মক পানিশূন্যতা এবং কলেরা রোগ নিয়ে আইসিডিডিআর,বির ঢাকা হাসপাতালে উচ্চহারে রোগী ভর্তি হওয়ায় ধারণা করা যায় যে, বিনামূল্যে কার্যকর চিকিৎসা প্রদানের ফলে এই আগস্ট মাসে প্রায় ৬,০০০ জন রোগীর জীবন রক্ষা পেয়েছে। ডায়রিয়া নিয়ে আগত রোগীদেরকে প্রচুর পরিমাণে মুখে খাবার স্যালাইন ও অন্যান্য পানীয়/তরল খাবার দিয়ে চিকিৎসা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা হিসেবে এখনো অব্যাহত রয়েছে।

icddr,b
KNOWLEDGE FOR GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

এই গ্রীষ্মে এশিয়ার উপ-মহাদেশে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং ফলে এ-অঞ্চল বন্যাকবলিত হয়েছে। স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি মৌসুমী বৃষ্টিপাত ছাড়াও উপমহাদেশের এ-অঞ্চলজুড়ে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে পুঞ্জীভূত পানি বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীসমূহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার ফলে নদ-নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করে এবং দু'কুল প্লাবিত হয়ে এ-বন্যার সৃষ্টি করে, যার ফলে বাংলাদেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এবছর বন্যায় নদীসমূহের পানি যতদিন বিপদসীমা অতিক্রম করেছে তার সাথে বিগত বছরগুলোর বন্যার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছে। এতে দেখা যায়, ২০০৭-এর বন্যায় পানির গড় উচ্চতা ছিলো অন্যান্য বছরের বন্যার পানির গড় উচ্চতা থেকে বেশি। তবে এটি ২০০৪, ১৯৯৮ অথবা ১৯৮৮ সালের বন্যার মতো মারাত্মক ছিলো না (১)। তা সত্ত্বেও, বিভিন্ন প্রতিবেদনে অনুমিত হিসাব অনুযায়ী এ-বছরের বন্যায় এক কোটি মানুষ স্থানচ্যুত হয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষ ভয়াবহ বন্যা এবং এ-ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট পানিবাহিত রোগসহ অসংখ্য সমস্যার সাথে পরিচিত। এ-বছর বন্যা-উপদ্রুত এলাকায় বহুবার ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ২০০৪ সালের বন্যার মতো এ-বছরের বন্যায় ঢাকার জনজীবন ততটা ব্যাহত না হলেও মহানগরী জুড়ে পানিবাহিত রোগ ছড়ানোর জন্য এর ব্যাপকতা ছিলো যথেষ্ট।

আইসিডিডিআর,বির ঢাকা হাসপাতাল ডায়রিয়া চিকিৎসার জন্য একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান এবং এটি ১৯৬২ সাল থেকে ঢাকার জনগোষ্ঠিকে চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছে। সচ্ছল রোগীর বেলায় নিবন্ধিকরণ বাবদ ৩০ টাকা (০.৪৫ মার্কিন ডলার) পরিশোধ করতে অনুরোধ করা হয়, আর যারা তা দিতে অক্ষম, তাদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হয়। মৌসুমীবন্যার সময় প্রায়ই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বর্ধিতসংখ্যক রোগীদের সেবাদানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। সারাবছর বাংলাদেশে যে ডায়রিয়া হয় তার কারণ এবং জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জীবাণুর প্রতিরোধের ধরন নির্ণয় করার জন্য বর্তমানে চালু সার্ভিলেন্সের আওতায় হাসপাতালে আগত রোগীদের মল পরীক্ষা করা হয়। এ-লক্ষ্যে প্রতি ৫০তম (২%) রোগীর মল কালচার করা হয় এবং রোটাভাইরাস ও অন্যান্য অন্ত্রীয় জীবাণু নির্ণয়ের জন্য মলের অন্যান্য পরীক্ষা করা হয়।

আগস্ট ২০০৭-এর প্রথম সপ্তাহ থেকে আইসিডিডিআর,বির ঢাকা হাসপাতালে উল্লেখযোগ্য হারে রোগী বাড়তে থাকে। আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে রেকর্ডসংখ্যক রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয় (চিত্র ১)। ১৪ আগস্ট দৈনিক রোগীভর্তির একটি নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়, যেদিন ১,০৪৫ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়। ২০০৭-এর ১-৩১ আগস্ট সময়ে ২১,৪০১ জন ডায়রিয়া রোগীকে হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়, যা ২০০৬ সালের একই সময়ে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর (৭,২১৪) প্রায় তিনগুণ। এসব রোগীর অধিকাংশই ঢাকা মহানগর এলাকায় বাস করে; ৮-১৫ আগস্ট সময়ে হাসপাতালে ভর্তিকৃত ৮৫% রোগী আসে ঢাকা থেকে এবং সকল রোগীর মধ্যে ৪২% আসে বাড্ডা, সবুজবাগ ও খিলগাঁও এই তিনটি থানা এলাকা থেকে। ঢাকার বাইরে থেকে আসা রোগীদের মধ্যে অর্ধেক আসে টঙ্গী অথবা কেরানীগঞ্জ থানা এলাকা থেকে। এসময় কোনো রোগীর কাছ থেকেই নিবন্ধিকরণ বাবদ ৩০ টাকা ফিস নেওয়া হয় নি।

চিত্র ১: ২০০৬ এবং ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে ঢাকা হাসপাতালে রোগী উপস্থিতির তুলনামূলক চিত্র

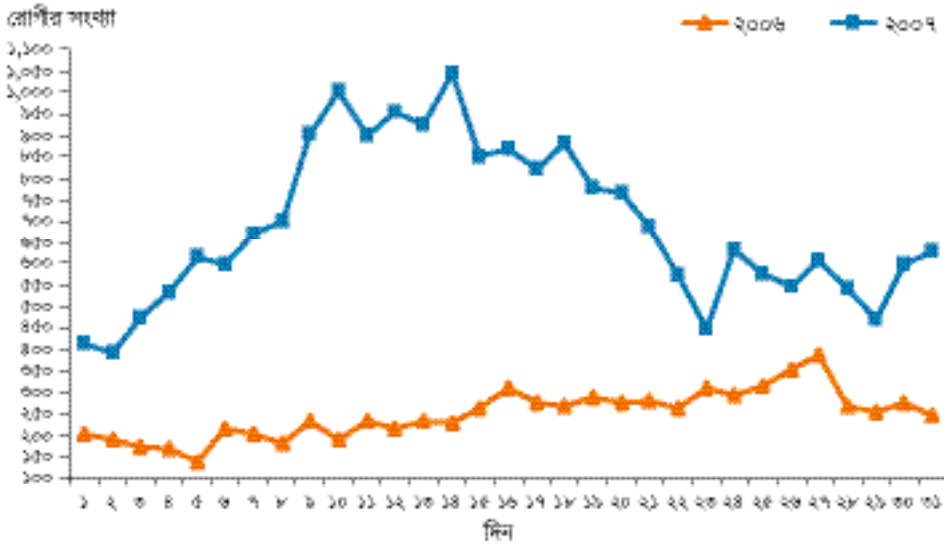

অন্য সময়ের রোগীদের তুলনায় বন্যার সময়ে (আগস্ট ২০০৭) ভর্তি হওয়া রোগীরা বেশি অসুস্থ ছিলো। এ-মাসে ২৬ জন রোগীকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। পাঁচ বছর বা তার চেয়ে বেশি-বয়সী রোগীদের মধ্যে ৭০% রোগী তীব্র পানিশূন্যতা নিয়ে হাসপাতালে আসে (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিবর্তিত সংজ্ঞা অনুযায়ী) (২)। এছাড়া, ১-৩১ আগস্টের মধ্যে হাসপাতালে ভর্তিকৃত মাত্র ১৪ জন রোগী মারা যায়, তবে তাদের কেউই পানিশূন্যতা কিংবা ডায়রিয়ার কারণে মারা যায় নি।

৮-২৩ আগস্ট সময়ে যখন হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা সর্বোচ্চ, তখন ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় ৩৫% রোগীকে কলেরায়, ১৫%-কে এন্টারোটক্সিজেনিক *ইস্কেরেচিয়া কলাই* বা ইটিইসি-তে, এবং ১২%-কে রোটাভাইরাসে আক্রান্ত দেখা যায়, তবে বয়সভেদে রোগের ব্যাপকতায় পার্থক্য দেখা যায় (সারণি ১)। শতকরা ৪৫ জন রোগীর মলের নমুনায় কোনোপ্রকার জীবাণু পাওয়া যায় নি, এবং শতকরা সাতভাগ রোগীর নমুনায় একাধিক জীবাণু সনাক্ত করা গেছে।

ভিব্রিও কলেরি ও১, এলটর-এর ওগাওয়া এবং ইনাবা উভয় প্রজাতির (সাব-টাইপ) জীবাণু দ্বারা রোগীরা আক্রান্ত হয়েছিলো (সারণি ১)। কিরবি-বয়ার পদ্ধতি অনুযায়ী এসব জীবাণুকে সিপ্রোফ্লোক্সাসিনে সংবেদনশীল দেখা গেছে। তবে টেট্রাসাইক্লিনের বিরুদ্ধে কিছুটা এবং সালফামেথোক্সাজোল এবং ফুরাজোলিডোনের বিরুদ্ধে ১০০% প্রতিরোধী দেখা গেছে (এ-সংখ্যায় প্রকাশিত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স প্রতিবেদন দেখুন)। ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব যখন ব্যাপক পর্যায়ে, তখন কলেরা জীবাণুর ১৯টি নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং সেগুলোর ফেনোটাইপিক ও মোলেকুলার বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাপকভাবে গবেষণা করা হয়। সেগুলো এলটর বায়োটাইপের হওয়া সত্ত্বেও, রোগ সৃষ্টি করার মতো প্রচণ্ড ক্ষমতার (ভাইরুলেন্স) সাতটি চিহ্নসহ সেগুলোর মধ্যে ক্লাসিক্যাল

বায়োটাইপের কলেরা টক্সিনের বৈশিষ্ট্যও দেখা গেছে। অধিকাংশ ইটিইসি জীবাণুই ছিলো বহু ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী, তবে ফুরাজোলিডোন (১০০%), মেসিলিনাম (১০০%), এবং সেফট্রিআক্সোনের (৯৫%) প্রতি আগের মতো খুবই সংবেদনশীল।

সারণি ১: ৮-২৩ আগস্ট ঢাকা হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের মধ্য থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে সংগৃহীত শতকরা দু'জন রোগীর মলের নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত ডায়রিয়ার কারণসমূহ

রোগের কারণ	মোট (সংখ্যা=২৫২)	পাঁচ বছরের কম-বয়সী (সংখ্যা=৯৮)	পাঁচ বছর বা তার বেশি-বয়সী (সংখ্যা=১৫৪)
ভিব্রিও কলেরি ও১	৩৫%	২১%	৪৪%
ইনাবা	২০%	১৪%	২৪%
ওগাওয়া	১৫%	৭%	১৯%
শিগেলা	১%	২%	০%
সালমোনেলা	১%	২%	০%
ইটিইসি	১০%	১৩%	৮%
রোটাভাইরাস	১২%	২৮%	২%
ই. হিসটোলাইটিকা	১%	০%	১%
জিয়ারডিয়া ল্যাম্বলিয়া	২%	১%	৩%
কোনো জীবাণু পাওয়া যায় নি	৪৫%	৪৪%	৪৬%
একাধিক জীবাণু পাওয়া গেছে	৭%	২১%	৪%

প্রতিবেদক: ঢাকা হাসপাতাল এবং ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস ডিভিশস, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: আইসিডিডিআর,বিকে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যেসব দাতাসংস্থা সাহায্য করছে (২১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মন্তব্য

আগস্টের শুরুতে আইসিডিডিআর,বির ঢাকা হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের জন্য আগত রেকর্ডসংখ্যক রোগীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের সংযোগ সড়ক ও কেন্দ্রের মূল চত্বরে গাড়ী রাখার জায়গায় তাঁবু টানিয়ে হাসপাতালের কলেবর বৃদ্ধি করা হয়। এসব রোগীদের চিকিৎসা দিতে হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে আইসিডিডিআর,বির অন্যান্য বিভাগে কর্মরত চিকিৎসকেরাও যোগ দেন। তীব্র পানিশূন্যতা এবং কলেরা নিয়ে উচ্চহারে রোগী ভর্তি হওয়া থেকে অনুমান করা যায় যে, বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা না পেলে আমাদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ৩০% রোগী হয়তো বাঁচতো না। এ-থেকে ধারণা করা যায় যে, আগস্ট মাসে আইসিডিডিআর,বির ঢাকা হাসপাতালে প্রায় ৬,০০০ জন রোগীর জীবন রক্ষা পেয়েছে। এ-সময়ে রোগীমৃত্যুর সংখ্যা লক্ষ্যণীয়ভাবে কম ছিলো এবং একটি রোগীও পানিশূন্যতা কিংবা ডায়রিয়ার কারণে মারা যায় নি। এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশি রোগী তীব্র পানিশূন্যতা নিয়ে এবার হাসপাতালে আসে, যা শতকরা হিসাবে বিগত তিনটি বন্যাবছরের যেকোনোটির থেকে দ্বিগুণেরও বেশি। এসব বিষয় এমন একটি পদ্ধতি অবলম্বনের দিক নির্দেশ করে যা ডায়রিয়াজনিত মৃত্যুহার প্রতিরোধ করতে জাতীয়ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই হাসপাতালের ইতিহাসে পূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় এবারের বন্যা মৌসুমে অধিকসংখ্যক রোগীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে, যদিও পূর্ববর্তী বছরগুলোতে বহুবার এরকম অবস্থা হয়েছে এবং সেসব বন্যা ছিলো এবারকার চেয়েও তীব্র (১,৩)। এর একটি কারণ হতে পারে – যদিও ব্যাপক মাত্রায় ডায়রিয়াজনিত রোগ ছড়ানোর জন্য যথেষ্ট প্লাবন ছিলো, তথাপি বন্যার ব্যাপকতা অতটা তীব্র ছিলো না যাতে ডায়রিয়া-আক্রান্ত মানুষদের সেবা পেতে অসুবিধা হয়। ক্রমাগতভাবে এ-শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সুপেয় পানির অভাব এবং দুর্বল পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার মধ্যে স্বল্প-আয়ের মানুষের বসতি বৃদ্ধি অধিকসংখ্যক রোগীর চিকিৎসা নিতে আসার আরো একটি কারণ হতে পারে। অধিকন্তু, ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব যখন তুঙ্গে, তখন সনাক্তকৃত *ভি. কলেরি* জীবাণুর প্রজাতিগুলোর দ্বারা সৃষ্ট রোগের তীব্রতাও (ভিরুলেন্ট) রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। এসব প্রজাতি এবং এগুলোর মহামারী ঘটানোর মতো সামর্থের বিষয় বাংলাদেশে ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে (৪)।

এবার বন্যা মৌসুমে ডায়রিয়ার সবচেয়ে বড় কারণ ছিলো কলেরা, তারপর রোটাভাইরাস। এবারকার রোগের এই ধরন ২০০৪, ১৯৯৮ এবং ১৯৮৮ সালের তিনটি বন্যার সময়কার রোগের মতই ছিলো (৩)। যেসব স্থানীয় চিকিৎসক ডায়রিয়া রোগীর চিকিৎসা করে থাকেন তাঁদের জন্য সার্ভিলেন্স প্রতিবেদন এবং জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে জীবাণুসমূহের প্রতিরোধী হওয়া-সংক্রান্ত খবর একটি নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করতে পারে (যা প্রতি তিনমাস পরপর স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তায় প্রকাশিত হয়)। তবে কলেরা ও অন্যান্য ডায়রিয়ার জীবাণুর মধ্যে জীবাণুনাশক ওষুধ প্রতিরোধের ধরন এবং রোগের কারণ দ্রুত পরিবর্তন হতে পারে (৫) এবং বাংলাদেশের অধিকাংশ ক্লিনিকে রোগ নির্ণয়ের সুবিধা না থাকায় ডায়রিয়া-জনিত রোগের কারণ নির্ণয় করা কদাচিৎ সম্ভব হয়। এমনকি আইসিডিডিআর,বি ল্যাবরেটরিতে রোগ-নির্ণয়ের অত্যাধুনিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আগস্ট মাসে আইসিডিডিআর,বির ঢাকা হাসপাতালের ৪২% রোগীর মধ্য থেকে কোনো জীবাণু সনাক্ত করা যায় নি। অতএব, এ-গবেষণা থেকে সুপারিশ করা হচ্ছে যে, ডায়রিয়া-আক্রান্ত রোগীকে পানিশূন্যতা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে হবে।

ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আরো মারাত্মক বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গত ১০ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে ধারণা করা যায় যে, ডায়রিয়া-জনিত রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাবসহ আগামী দশকে দেশ কমপক্ষে দু'বছর প্রবল বন্যায় আক্রান্ত হবে। এ-ধরনের দুর্যোগসমূহকে 'জরুরি' অবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। তবে এসব দুর্যোগ পূর্বেই অনুমান করা সম্ভব এবং এ-থেকে মানুষের ভোগান্তি ও মৃত্যু রোধ করাও সম্ভব। কলেরা টিকা দিয়ে রোগের মাত্রা কমানো যেতে পারে। বাসাবাড়িতে শোধিত পানি সরবরাহ পদ্ধতি গণহারে বিতরণের মাধ্যমে বন্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠির মধ্যে এই রোগের বিস্তার হ্রাস করা যেতে পারে। তবে, যতদিন না নিরাপদ খাবার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা বিস্তৃত আকারে নিশ্চিত করা যাবে, ততদিন বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠি ডায়রিয়াজনিত অসুস্থতার এই কঠিন সমস্যায় ভুগতেই থাকবে।

বন্যাকালীন সময়ে অতিরিক্ত রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য যেসব ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান আইসিডিডিআর,বিকে সাহায্য করেছে এবং এখনো করছে তাদের সহৃদয় সহযোগিতার জন্য আইসিডিডিআর,বি কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদী কাশিতে ভোগা প্রাপ্তবয়স্কদের চিকিৎসাসেবা গ্রহণের ধরন এবং বেসরকারি চিকিৎসকগণ (প্রাইভেট প্রাক্টিশনার)-কর্তৃক তাদের ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে বর্তমানে যক্ষ্মারোগ নির্ণয় নির্ভর করে জাতীয় যক্ষ্মা-নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত ডটস ক্লিনিকসমূহে (স্বল্পমেয়াদী, সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিকিৎসা) দীর্ঘমেয়াদী কাশির জন্যে চিকিৎসা নিতে আসা ব্যক্তিদের ওপর। ঢাকায় পরিচালিত একটি এলাকাভিত্তিক সমীক্ষায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিন বা ততোধিক সপ্তাহ ধরে কাশিতে ভোগা (সন্দেহভাজন যক্ষ্মা রোগী) ব্যক্তিদের সনাক্ত করা হয় এবং তাঁদের চিকিৎসাসেবা গ্রহণের ধরন-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ৬০,৩৮২ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে ১,১৩৮ (২%) জন জানিয়েছেন যে, তাঁরা তিন বা ততোধিক সপ্তাহ ধরে কাশিতে ভুগছিলেন এবং তাঁদের মধ্য থেকে ৬৪৮ জন জানিয়েছেন যে, তাঁরা এজন্যে কোনো না কোনো চিকিৎসাসেবা নিয়েছেন। যাঁরা চিকিৎসাসেবা নিয়েছেন তাঁদের ১৬% সরাসরি ডটস ক্লিনিক থেকে চিকিৎসাসেবা নিয়েছেন। বাকি ৮৪% চিকিৎসাসেবা নিয়েছেন বেসরকারি চিকিৎসক এবং অন্যান্য চিকিৎসাসেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে। তাঁদের ৪৪% সনদবিহীন চিকিৎসক, ১৭% সনদপ্রাপ্ত চিকিৎসক এবং ২৩% ওষুধ-বিক্রেতা বা অন্য ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে চিকিৎসাসেবা নিয়েছেন। ডটস কর্মসূচি সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রচারণা থাকা সত্ত্বেও বেসরকারি চিকিৎসকদের কাছে চিকিৎসাসেবা নিতে যাওয়া রোগীদের মাত্র শতকরা একভাগেরও কম দীর্ঘমেয়াদী কাশির রোগীকে ডটস ক্লিনিকে যাওয়ার জন্য রেফার করা হয়েছে। এই গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে, যক্ষ্মারোগ নির্ণয়ের লক্ষ্যে বেসরকারি চিকিৎসকদের পর্যাপ্তভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না এবং বেসরকারি চিকিৎসকেরাও বর্তমানে ডটস ক্লিনিকগুলোতে প্রাপ্ত সুবিধাদি ব্যবহার করছেন না।

২০০৫ সালে সারা পৃথিবীতে যক্ষ্মারোগে উচ্চঝুঁকিপূর্ণ ২২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ছিলো পঞ্চম (১)। স্বল্পমেয়াদী, সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিকিৎসা (ডটস) হচ্ছে বর্তমানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকর্তৃক সুপারিশকৃত যক্ষ্মা-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। তবে এ-কর্মসূচির মাধ্যমে রোগ-নির্ণয়ের হার বিশ্বব্যাপী এখনো কম (৬০%) এবং বাংলাদেশে এ-হার ৫৯% (১) এবং ৭১% (২) হিসাবে অনুমান করা হয়। সাধারণত চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহে স্বেচ্ছায় চিকিৎসাসেবা নিতে আসা যক্ষ্মারোগের লক্ষণসম্বলিত ব্যক্তিদের সাথে চিকিৎসাসেবা প্রদানকারীদের রোগ নির্ণয়ে পরিচালিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যক্ষ্মারোগ সনাক্ত করা হয় (৩)। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলো খুব সামান্য এবং যা প্রায়ই মেয়াদী কাশি দিয়ে শুরু হয় (৪,৫)। তাই ১৫ বছরের বেশি-বয়সীদের মধ্যে দু-তিন সপ্তাহের অধিক দীর্ঘমেয়াদী কাশি ফুসফুসের যক্ষ্মারোগ সন্দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয় (৫)। যদিও বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ সনদপ্রাপ্ত এবং সনদবিহীন বেসরকারি চিকিৎসকদের কাছ থেকে চিকিৎসাসেবা নিয়ে থাকেন (৬,৭), তবে দীর্ঘমেয়াদী কাশিতে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের চিকিৎসাসেবা নেওয়ার ধরন এবং তার ফলাফল সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য ছিলো, দীর্ঘমেয়াদী কাশিতে ভোগা প্রাপ্তবয়স্কদের চিকিৎসা

নেওয়ার ধরন সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং এধরনের রোগীদের চিকিৎসা প্রদানে শহুরে বেসরকারি চিকিৎসকদের ভূমিকা সম্পর্কে আরো ভালভাবে অবহিত হওয়া।

আলোচ্য গবেষণা সম্পাদনের জন্য দু'টি সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। প্রথমটি ছিলো ঢাকায় বসবাসকারী দীর্ঘমেয়াদী কাশিতে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্কদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের ওপর পরিচালিত সমীক্ষা এবং দ্বিতীয়টি ঢাকা এবং চট্টগ্রামে কর্মরত বেসরকারি চিকিৎসকদের ওপর পরিচালিত সমীক্ষা।

দীর্ঘমেয়াদী কাশিতে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্কদের ওপর পরিচালিত সমীক্ষা

সমীক্ষার জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত দু'টি প্রশাসনিক এলাকা বাছাই করা হয়। এলাকা দু'টি হলো, কমলাপুর এবং লালবাগ। প্রশিক্ষিত মাঠসহকারীদের দ্বারা কমলাপুরের বাড়িসমূহ এবং লালবাগের তিনটি ওয়ার্ডের বাড়িসমূহে সমীক্ষা করা হয়। একনাগাড়ে তিন সপ্তাহের অধিক সময় ধরে কাশিতে আক্রান্ত ১৫ বছর বা তার বেশি-বয়সী ব্যক্তিদেরকে সনাক্ত করে তালিকাভুক্ত করা হয়। প্রশিক্ষিত সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীরা তালিকভুক্তদের বাড়ি পরিদর্শন করেন, সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁদের সম্মতি নেন এবং তাঁদের কাশি আছে কি না সেসম্পর্কে নিশ্চিত হন এবং তারপর তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। তালিকাভুক্ত যেসব ব্যক্তিকে প্রথমবার পরিদর্শণের সময় পাওয়া যায় নি, তাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য তাঁদের বাড়িসমূহে দ্বিতীয়বার পরিদর্শনে যাওয়া হয়। ২০০৫ সালের মার্চ থেকে আগস্টের মধ্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। চিকিৎসাসেবা নেওয়ার ইতিহাস, গৃহীত চিকিৎসাসেবাসমূহ এবং চিকিৎসা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ডটস বা অন্য কোনো কেন্দ্রে চিকিৎসকগণ-কর্তৃক রোগীদেরকে রেফার করা-সংক্রান্ত তথ্যাবলি সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

বেসরকারি চিকিৎসকগণের ওপর পরিচালিত সমীক্ষা

ঢাকা এবং চট্টগ্রামের সনদপ্রাপ্ত এবং সনদবিহীন উভয় শ্রেণীর চিকিৎসকদের চেম্বারে গিয়ে তাঁদের ওপর সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। চট্টগ্রামে ৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে সবচেয়ে জনবহুল ও সবচেয়ে বেশি-সংখ্যক চিকিৎসকসম্বলিত ১৮টি ওয়ার্ড সমীক্ষার জন্য বাছাই করা হয়। বাছাইকৃত ওয়ার্ডসমূহের সব চিকিৎসকের কাছে যাওয়া হয়। এমবিবিএস ডিগ্রিধারী চিকিৎসকদেরকে সনদপ্রাপ্ত এবং বাকি সবাইকে সনদবিহীন চিকিৎসক হিসেবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যেসব চিকিৎসক নিজস্ব চেম্বারে টাকার বিনিময়ে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী কাশিতে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করেন তাঁদেরকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ঢাকায় যেসব বেসরকারি চিকিৎসকের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারদানকারী রোগীরা তাঁদের দীর্ঘমেয়াদী কাশির চিকিৎসা নিয়েছেন, সেসব চিকিৎসকের একটি তালিকা তৈরি করা হয়। সনদবিহীন চিকিৎসকদের সাক্ষাৎকার নেন প্রশিক্ষিত গবেষণা সহকারীরা এবং সনদপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের সাক্ষাৎকার নেন একজন সনদপ্রাপ্ত চিকিৎসক। চিকিৎসকদের কাছ থেকে তাঁদের চিকিৎসা-সংক্রান্ত যোগ্যতা, কোনো বিষয়ে তাঁরা বিশেষজ্ঞ কি না, যক্ষ্মারোগ ব্যবস্থাপনা এবং চিকিৎসা করেন কি না, কতদিন ধরে চিকিৎসা করে আসছেন এবং কী ধরনের চিকিৎসা করেন এসব তথ্য জানার জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

চট্টগ্রামে সমীক্ষাটি পরিচালিত হয় ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে এবং ঢাকারটি

২০০৫ সালের মে থেকে নভেম্বরের মধ্যে। সাক্ষাৎকারদানকারীর সম্মতির ভিত্তিতে একটি সময় নির্ধারণ করে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের পর প্রত্যেককে ফি হিসেবে একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকা দেওয়া হয়।

ঢাকার সমীক্ষায় ৬০,৩৮২ জন প্রাপ্তবয়স্ককে বাড়িতে পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে ১,১৩৮ (২%) জন তিন সপ্তাহের অধিক সময় ধরে কাশিতে আক্রান্ত ছিলেন বলে জানিয়েছেন। দীর্ঘমেয়াদী কাশিতে আক্রান্ত রোগী হিসেবে সনাক্তকৃত এই ১,১৩৮ জনের মধ্যে ১,০৪৬ (৯২%) জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এঁদের মধ্যে ৬৪৮ (৬২%) জন কোনো না কোনো স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন। এই ৬৪৮ জনের মধ্যে ৮৪% (৫৪২ জন) বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। বাকি ১৬% (১০৬ জন) কোনো রেফারেল ছাড়া এনজিও অথবা সরকারি ডটস কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন। যাঁরা প্রথমে কোনো বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ৪৪% (২৮৩ জন) সনদবিহীন বেসরকারি চিকিৎসকদের কাছ থেকে, ২৩% (১৪৮ জন) ওষুধের দোকান (ফার্মেসি) এবং অন্য কোনো সূত্র থেকে (আয়ুর্বেদ এবং হোমিওপ্যাথ) এবং ১৭% (১১১ জন) সনদপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের কাছ থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন (চিত্র ১)। যে ৬৪৮ জন চিকিৎসা নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ২৬% (১৭১ জন) একাধিক চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন।

চিত্র ১: দীর্ঘমেয়াদী কাশিতে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের মধ্যে যারা চিকিৎসাসেবা নিয়েছেন

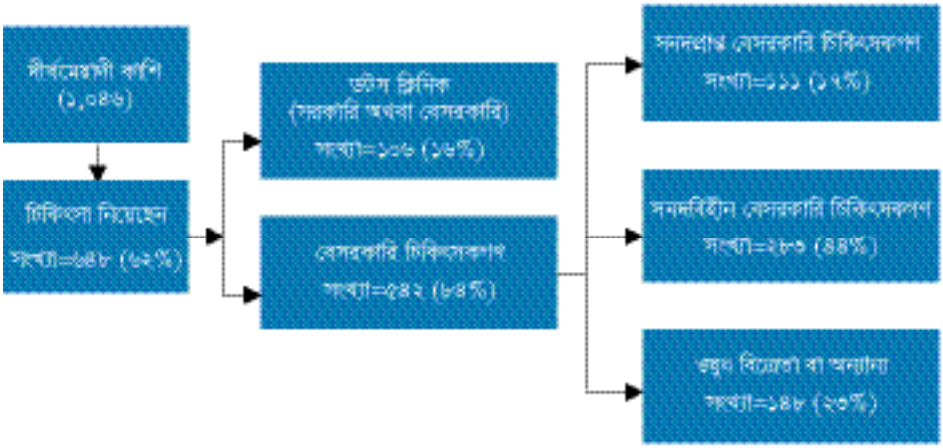

দীর্ঘমেয়াদী কাশিতে আক্রান্ত রোগীদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বলেছেন যে, তাঁরা শুধুমাত্র কাশিতে আক্রান্ত ছিলেন, ৩৮% কাশি ছাড়াও জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন, ৫৩%-এর বুকে ব্যথা এবং ১২%-এর ক্ষুধামান্দ্য ছিলো বলে তাঁরা জানিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১৭% পূর্বে যক্ষ্মায় আক্রান্ত ছিলেন বলে জানিয়েছেন, এবং ২০% যক্ষ্মারোগের তিন বা ততোধিক লক্ষণের কথা সঠিকভাবে বলতে

পেরেছেন (কাশি, জ্বর, বুকে ব্যাথা, রাতে শরীর ঘামা, ওজন কমা, ক্ষুধামান্দ্য, কাশির সাথে রক্ত পড়া)। যাঁরা অপেক্ষাকৃত বেশি শিক্ষিত, যাঁদের আয় বেশি, যাঁরা পূর্বে যক্ষ্মায় আক্রান্ত বলে জ্ঞাত, যাঁরা মহিলা, যাঁদের মধ্যে যক্ষ্মারোগের তিন বা ততোধিক লক্ষণ ছিলো অথবা তিন বা ততোধিক লক্ষণ সম্পর্কে যাঁরা সঠিকভাবে বলতে পেরেছেন, তাঁদের কোনো না কোনো বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে চিকিৎসা নেওয়ার হার বেশি ছিলো (সারণি ১)। সনদপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের কাছ থেকে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রেও এই সম্পর্কের তেমন পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু প্রথমেই বেসরকারি চিকিৎসকদের কাছ থেকে চিকিৎসা নিতে যাওয়া এসব রোগীদের শতকরা একজনের কম রোগীকে কোনো না কোনো ডটস ক্লিনিকে রেফার করা হয় (সারণি ২)।

সারণি ১: দীর্ঘমেয়াদী কাশির জন্য চিকিৎসাসেবা নেওয়া সংক্রান্ত বিষয়সমূহ

বিষয়সমূহ	যেকোনো চিকিৎসকের কাছ থেকে সেবা নিয়েছেন (সংখ্যা=৬৪৮) ক্রুড আরআর (৯৫% সিআই)	সনদপ্রাপ্ত বেসরকারি চিকিৎসকের কাছ থেকে সেবা নিয়েছেন (সংখ্যা=১১১) ক্রুড আরআর (৯৫% সিআই)
লিঙ্গ		
পুরুষ	১.০০	১.০০
মহিলা	১.১৬ (১.০৫-১.৩)*	১.০১ (০.৭১-১.৪)
শিক্ষা		
বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা নেন নি	১.০০	১.০০
বিদ্যালয় থেকে কিছুদিন শিক্ষা নিয়েছেন	১.০২ (০.৯১-১.২)	১.২৪ (০.৮১-১.৯)
মাধ্যমিক +	১.০৬ (০.৯৪-১.২)	১.৮৪ (১.২৫-২.৭)*
সাংসারিক খরচ		
৪,৫০০ টাকার কম	১.০০	১.০০
৪,৫০০ টাকার বেশি	১.১৫ (১.০৫-১.৩)*	২.০১ (১.৪০-২.৯)*
সম্পত্তি (অ্যাসেট কোয়ার্টাইল)		
প্রথম (সর্ব নিম্ন)	১.০০	১.০০
দ্বিতীয়	০.৯৭ (০.৮৪-১.১)	১.৯৮ (১.০২-৩.৮)*
তৃতীয়	০.৯৭ (০.৮৪-১.১)	২.৬৬ (১.৪২-৫.০)*
চতুর্থ (সর্বোচ্চ)	১.০২ (০.৮৯-১.২)	৩.৭০ (২.০৪-৬.৭)*
অতিরিক্ত লক্ষণসমূহ **		
একটি লক্ষণ	১.০০	১.০০
দুটি লক্ষণ	১.০৬ (০.৯৩-১.২)	১.০০ (০.৬০-১.৬)
তিন বা ততোধিক লক্ষণ	১.১৬ (১.০৩-১.৩)*	১.৬১ (১.০৪-২.৫)*
অতীতে যক্ষ্মা সনাক্ত		
না	১.০০	১.০০
হ্যাঁ	০.৯৬ (০.৮৫-১.১)	১.৫২ (১.০৩-২.২)*
যক্ষ্মার তিন বা ততোধিক লক্ষণের কথা বলতে পেরেছেন		
না	১.০০	১.০০
হ্যাঁ	১.২০ (১.০৮-১.৩)*	১.৬১ (১.১৩-২.৩)*

*পি<০.০৫ **বুকে ব্যাথা, জ্বর, ওজন কমা, রাতে শরীর ঘামা, খুধামন্দা, ইত্যাদি

সারণি ২: দীর্ঘদিন ধরে কাশিতে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের দ্বারা গৃহীত চিকিৎসাসেবাসমূহ

গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	সনদপ্রাপ্ত বেসরকারি চিকিৎসক সংখ্যা=১১১ %	সনদবিহীন বেসরকারি চিকিৎসক সংখ্যা=২৮৩ %	ওষুধ বিক্রেতা এবং অন্যান্য সংখ্যা=১৪৮ %
উপদেশ দিয়েছেন	৬.০	১.০	১.০
পরীক্ষা করতে পরামর্শ দিয়েছেন	৩৮.০	২.০	৫.০
ওষুধ খেতে পরামর্শ দেয়েছেন	৯৫.০	৯৮.০	৯৫.০
ডটস কেন্দ্রে রেফার করেছেন	০.০	১.০	০.০
অন্য চিকিৎসকের কাছে রেফার করেছেন	২.০	১.০	০.০

মোট ৫৫৭ জন বেসরকারি চিকিৎসকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এঁদের মধ্যে ২৫৮ (৪৬%) জন ছিলেন সনদপ্রাপ্ত এবং ২৯৯ (৫৪%) জন ছিলেন সনদবিহীন। প্রায় একই আনুপাতিক হারে সনদপ্রাপ্ত (৪৬%) এবং সনদবিহীন (৪১%) চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন যে, একনাগাড়ে তিন বা ততোধিক সপ্তাহ ধরে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কাশিতে ভুগে থাকলে তাঁরা তাঁকে যক্ষ্মারোগী হিসেবে সন্দেহ করেন (সারণি ৩)। সনদবিহীন চিকিৎসকদের তুলনায় বেশিসংখ্যক সনদপ্রাপ্ত চিকিৎসক জানিয়েছেন যে, তাঁরা রোগীদেরকে বুকের এক্সরে করার পরামর্শ দিয়েছিলেন (৯৬% বিপরীতে ৮১%) এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন (৬৪% বিপরীতে ৪%)। কিন্তু কমসংখ্যক সনদপ্রাপ্ত চিকিৎসক রোগীদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে (১% বিপরীতে ৩২%) অথবা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে (৩৫% বিপরীতে ৪৮%) অন্য কোথাও রেফার করেছিলেন (সারণি ৩)। বেসরকারি চিকিৎসকদের মধ্যে যাঁরা রোগীদেরকে অন্য কোথাও রেফার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ৮৮% সনদপ্রাপ্ত এবং ৭৯% সনদবিহীন চিকিৎসক রোগীদেরকে কোনো না কোনো যক্ষ্মা-চিকিৎসা ক্লিনিকে রেফার করেছিলেন।

সারণি ৩: সনদপ্রাপ্ত এবং সনদবিহীন বেসরকারি চিকিৎসকগণকর্তৃক দীর্ঘমেয়াদি কাশিতে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের চিকিৎসাসেবার তুলনামূলক চিত্র

বর্ণীত চিকিৎসা	সনদপ্রাপ্ত (সংখ্যা=২৫৮) % (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল)	সনদবিহীন (সংখ্যা=২৯৯) % (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল)
তিন সপ্তাহের বেশি কাশি		
সন্দেহজনক যক্ষ্মা	৪৬ (৪০-৫২)	৪১ (৩৫-৪৬)
চিকিৎসা		
ব্যবস্থাপত্রে ওষুধ খেতে সুপারিশ	০.৪ (০.৪-১.২)	২ (০.২-৩)
পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ওষুধ খেতে সুপারিশ	৬৪ (৫৮-৭০)*	৪.০ (২-৬)
প্রাথমিক পর্যায়ে রেফার	১ (১-৩)	৩২ (২৭-৩৮)*
পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রেফার	৩৫ (২৯-৪১)	৪৮ (৪২-৫৩)*
পরীক্ষা-নিরীক্ষা **	**(৯৮%)**	**(৫২%)**
এক্সরে	৯৬ (৯৪-৯৯)*	৮১ (৭৫-৮৭.৪)
কফ পরীক্ষা	৮১ (৭৬-৮৬)	৭৭ (৭১-৮৪)
মোনটোক্স পরীক্ষা	৬৫ (৫৮-৭২)	৬২ (৫৫-৭০)
যেখানে রেফার করা হয়েছে **	**(৩৬%)**	**(৯৪%)**
যক্ষ্মা ক্লিনিক	৮৮ (৮২-৯৫)	৭৯ (৭৪-৮৪)
যক্ষ্মা বিশেষজ্ঞ	৬ (১-৪)	১৪ (১০-১৮)*
অন্যান্য হাসপাতাল	৫ (১-১০)	২৪ (১৯-২৯)*

*পি<০.০৫ সনদপ্রাপ্ত বনাম সনদবিহীন চিকিৎসক **একাধিক উত্তর

প্রতিবেদক: হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা

মন্তব্য

এ-গবেষণায় দেখা যায়, দীর্ঘমেয়াদী কাশিতে আক্রান্ত রোগীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ রোগী কোনো না কোনো চিকিৎসা নিয়েছেন, যা ভারতে পরিচালিত কোনো গবেষণার ফলাফলের অনুরূপ (৮,৯)। যাঁরা চিকিৎসা নিয়েছেন তাঁদের ৮০%-এর বেশি বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে নিয়েছেন। কিন্তু প্রায়শই বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে এসব রোগীদের খুব গুরুত্ব সহকারে বা খতিয়ে দেখা হয় না (৪)।

এশিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চলে বেসরকারি চিকিৎসা খাতের প্রভাব ব্যাপক। স্বল্প-শিক্ষিত, সনদবিহীন চিকিৎসকেরা গ্রামাঞ্চলের এবং স্বল্প-আয়ের বিরাট জনগোষ্ঠিকে চিকিৎসা দিয়ে থাকেন (৮,৯)। চিকিৎসার জন্য স্বল্প-শিক্ষিত চিকিৎসকদেরকে মানুষ কেন বেছে নিচ্ছে তার কারণ পর্যাপ্তরূপে গবেষণা করা হয় নি। তবে সহজে এবং কম-খরচে চিকিৎসা পাওয়া, চিকিৎসকদের সাথে পূর্ব-

পরিচিতি এবং বন্ধুসুলভ সেবা পাওয়ার জন্যে এটি হতে পারে। শুধুমাত্র দীর্ঘমেয়াদী কাশির জন্যেই নয় বরং অন্যান্য সব রোগের চিকিৎসাতেও সনদবিহীন চিকিৎসকদেরকেই ওইসব মানুষের প্রথম পছন্দ হিসেবে দেখা গেছে (১০)।

ডটস ক্লিনিকে রেফার করার ক্ষেত্রে বেসরকারি চিকিৎসক এবং রোগীদের দেওয়া তথ্যের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য লক্ষণীয়। যক্ষ্মা-নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি এবং এর ডটস সুবিধাসমূহ রোগী ও চিকিৎসকদের কাছে কমবেশি পরিচিত। রোগীদেরকে হয়তো চিকিৎসকেরা রেফার করে থাকতে পারেন, তবে রোগীরা তা প্রকাশ করেন নি অথবা চিকিৎসকেরা আসলে যে ব্যবস্থা দিয়েছেন তার সাথে প্রদত্ত তথ্যের সত্যিকার অর্থেই পার্থক্য থাকতে পারে।

ডটস ক্লিনিকে রেফার করার ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো গুরুত্বসহকারে দেখা প্রয়োজন। এসব প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে ভালো করে জানতে এবং সেগুলো দূরীকরণার্থে আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। সম্ভবত যে দু'টি কারণে বেসরকারি চিকিৎসকেরা দীর্ঘমেয়াদী কাশিতে ভোগা রোগীদেরকে ডটস ক্লিনিকে রেফার করেন না বলে মনে হয়, সেগুলো হলো – জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি এবং বেসরকারি চিকিৎসকদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগের অভাব এবং দীর্ঘমেয়াদী কাশিতে ভোগা রোগীদেরকে সামগ্রিকভাবে চিকিৎসাসেবা প্রদানে ডটস ক্লিনিকসমূহের অপারগতা।

সাধারণত অধিকাংশ ডটস ক্লিনিক শুধুমাত্র যক্ষ্মারোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দ্বারা সমৃদ্ধ, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী কাশিতে ভোগা রোগীদেরকে সামগ্রিকভাবে চিকিৎসাসেবা প্রদানে অপারগ। চিকিৎসকেরা বলেছেন যে, তাঁরা ডটস ক্লিনিকসমূহ থেকে তাঁদের পাঠানো রোগীদের সম্পর্কে আর কিছু জানতে পারেন নি এবং রোগীরা হয় আর ফিরে আসেন নি অথবা সমস্যা নিয়ে ফিরে এসেছেন – প্রমাণ সাপেক্ষ এধরণের কিছু তথ্য পাওয়া গেছে।

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং ডটস-এর সার্থকতা অনেকাংশে নির্ভর করে এই কর্মসূচির আওতায় অধিকহারে রোগী সনাক্ত করার ওপর। আলোচ্য গবেষণা থেকে জানা যায় যে, বেসরকারি চিকিৎসকেরা দীর্ঘমেয়াদী কাশিতে ভোগা প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির একটি বিশাল অংশের প্রাথমিক চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। অথচ ডটস কর্মসূচিতে এই বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রদানকারীদের পর্যাপ্তভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। জরুরি ভিত্তিতে এবং ব্যাপকহারে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রদানকারীদের জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করতে পারলে অধিকহারে রোগী সনাক্তকরণে তা সহায়ক হতে পারে।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

গর্ভাবস্থায় মা আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করলে তাতে কি সন্তানের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়?

গর্ভাবস্থায় মা আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করলে গর্ভজাত শিশুর ওপর তার কী প্রভাব পড়ে তা পরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের মতলব এলাকায় ১,৫৬২ জন গর্ভবতী মায়ের ওপর আইসিডিডিআর,বির চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (সিডিইউ) একটি দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা পরিচালনা করে। গর্ভকালীন সময়ে এই মহিলারা যে পানি পান করেছেন তাতে কী পরিমাণ আর্সেনিক ছিলো তা অ্যাটোমিক অ্যাবজর্পশন-স্পেক্ট্রোসকপির মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। এই মায়েদের শিশুদের সাত মাস বয়সের সময় তাদের কগনাইটিভ (বুদ্ধিমত্তা) এবং সাইকোমটর (মাংসপেশীদ্বারা নিয়ন্ত্রিত চালচলন) পরীক্ষা করা হয়। এখানে শতকরা ৬৩ ভাগ নলকূপের পানিতে অতিরিক্ত মাত্রায় (প্রতি লিটারে ৫০ মাইক্রোগ্রামের বেশি) আর্সেনিক পওয়া গেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশুর মায়েরা প্রতি লিটারে ৫০ মাইক্রোগ্রামের অধিক আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করেছেন, সেসব শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি, যেসব শিশুর মায়েরা কম আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করেছেন তাদের থেকে সামান্য কম। এক্ষেত্রে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের এই পার্থক্যের রোগসম্পর্কীত (ক্লিনিক্যাল) গুরুত্ব কতখানি এবং পরবর্তীতে এর ফলাফল কী দাঁড়াবে তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই গবেষণার ফলাফল বাংলাদেশে আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব দমনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার স্বপক্ষে আরো প্রমাণ তুলে ধরেছে।

আর্সেনিক ব্যাপকভাবে বিস্তৃত একটি পরিবেশ-দূষণকারী পদার্থ। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর উপরে ওঠার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বহু মানুষ আর্সেনিকযূক্ত পানি পান করছে। এটি স্নায়ুর জন্য ক্ষতিকর (নিউরোটক্সিক্যান্ট) একটি পদার্থ এবং ক্যান্সার, চর্মরোগ ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী অসুখের কারণ হিসেবে পরিচিত। অতি সম্প্রতি স্কুলগামী শিশুদের ওপর পরিচালিত কিছু ক্রস-সেকশন্যাল গবেষণায় শিশুদের বিকাশে আর্সেনিকের নেতিবাচক প্রভাব দেখা গেছে। সিরিপিট্যাকুনকিট এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ তাঁদের পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখেছেন যে, ছয় থেকে নয় বছর-বয়সী যেসব থাই শিশু দীর্ঘদিন ধরে আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করেছিলো তাদের চুলে উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিক ছিলো এবং তাদের দৃষ্টি দিয়ে বোঝা বা উপলব্ধি করার ক্ষমতাও (ভিজুয়্যাল পারসেপশন) তুলনামূলকভাবে কম ছিলো (১)। কালডেরন (২) এবং রোসাডো (৩) মেক্সিকোর যেসব অঞ্চলে আকরিক গলানোর (স্মেলটার) কাজ হয়, সেসব অঞ্চলে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখেছেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের ওপর যৌথভাবে আর্সেনিক এবং লেডের প্রভাব পড়েছে, যার কারণে তাদের মৌখিক/শব্দগত বুদ্ধিমত্তা এবং দীর্ঘস্থায়ী স্মরণশক্তি কমে গেছে। একইভাবে, তাইওয়ানেও দেখা গেছে যে, দীর্ঘদিন যাবৎ যেসব শিশু আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করেছে, ডোজ রেসপন্স অনুযায়ী চারটি দক্ষতা (পারফরমেন্স) পরীক্ষার তিনটিতে তারা খারাপ করেছে (৪)। বাংলাদেশে পরিচালিত দু'টি গবেষণায় বিভিন্ন প্রকার কোভ্যারিয়েট নিয়ন্ত্রণ করা সত্ত্বেও উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিকযুক্ত চাপকলের পানি পান করার সাথে শিশুদের বুদ্ধিদীপ্ত কাজে কম

দক্ষতার একটি যোগসূত্র পাওয়া গেছে (৫,৬)। এসব গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে, আর্সেনিকের প্রভাবে খুব ছোট এমনকি ছয় বছর-বয়সী শিশুদেরও মানসিক ও শারীরিক বিকাশ সূক্ষ্মভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

এটি জানা গেছে যে, মানুষের ক্ষেত্রে আর্সেনিক ফুল বা প্লাসেন্টার ভিতর দিয়ে চলাচল করতে পারে (৭)। আরো জানা গেছে যে, পশুর ক্ষেত্রে এটি ব্লাড-ব্রেইন বেরিয়ার (রক্তনালী ও মস্তিষ্কের মধ্যবর্তী যে পর্দা) থাকে, সেটিও অতিক্রম করতে পারে (৪) এবং মস্তিষ্কের এঞ্জাইম তৈরির প্রক্রিয়াকেও প্রভাবিত করতে পারে (৯)। মানুষের মধ্যে পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণায় দেখা গেছে যে, উচ্চ-মাত্রায় আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করার সাথে কম ওজন নিয়ে শিশুর জন্মগ্রহণ (১০) এবং ভ্রূণ নষ্ট হওয়ার হার বেড়ে যাওয়ার একটি যোগসূত্র রয়েছে (১১)। তবে এখন পর্যন্ত এমন কোনো গবেষণা সম্পর্কে জানা যায় নি যাতে গর্ভকালীন সময়ে মায়ের ওপর আর্সেনিকের প্রভাব পরবর্তীতে শিশুর স্নায়বিক আচার-ব্যবহারের ওপর কী প্রভাব ফেলে তা দেখা গেছে। যেহেতু আর্সেনিক প্লাসেন্টা এবং ব্লাড-ব্রেইন-বেরিয়ার উভয়ই অতিক্রম করতে পারে, সেহেতু এটি অনুমান করা যায় যে, গর্ভকালীন সময়ে মা আর্সেনিকে আক্রান্ত হলে তা শিশুর ক্রমঃবিকাশমান মস্তিষ্ককে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে এবং তা শিশুর স্বল্প বুদ্ধির কারণ হতে পারে (১২)।

ব্রিটিশ জিওলোজিক্যাল সার্ভেকর্তৃক বাংলাদেশের ৪১টি জেলায় পরিচালিত এক গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে মোট দু'কোটি দশ লাখ মানুষ প্রতি লিটারে ৫০ মাইক্রোগ্রামের অধিক আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করে, যেখানে প্রতি লিটারে সর্বোচ্চ ৫০ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করতে বাংলাদেশ সরকার সমর্থন করে (১৩)। বাংলাদেশের একটি গ্রামীণ এলাকা মতলবে একটি বড় ধরনের গবেষণা পরিচালিত হয়, যেখানে ৫,০০০ জন গর্ভবতী মহিলাকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে পুষ্টি ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট (মিনিম্যাট) দেওয়া হয়। এই অঞ্চলের প্রায় ৭০% নলকূপে আর্সেনিকের পরিমাণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকর্তৃক নির্দেশিত মাত্রা (প্রতি লিটারে ১০ মাইক্রোগ্রাম) এবং ৬৩% নলকূপে বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত মাত্রা (প্রতি লিটারে ৫০ মাইক্রোগ্রাম) থেকে বেশি ছিলো। মিনিম্যাটের পাশাপাশি আরো একটি গবেষণার মাধ্যমে অ্যাটোমিক অ্যাবজরপশন স্পেক্ট্রোস্কোপির দ্বারা এই নলকূপগুলোর পানিতে আর্সেনিকের এই পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছিলো, যার উদ্দেশ্য ছিলো ওই এলাকার জনগণের সারাজীবনের ওপর আর্সেনিকের প্রভাব নিরুপণ করা। আমরা এই দু'টি গবেষণার ফলাফলকে একত্রিত করে গর্ভাবস্থায় মায়েদের আর্সেনিকে আক্রান্ত হওয়ার সাথে পরবর্তীতে তাদের শিশুদের বুদ্ধির বিকাশের কোনো সম্পর্ক আছে কি না তা পরীক্ষা করেছি। মিনিম্যাট গবেষণায় মোট ১,৫৬২ জন মায়ের আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করার তথ্য পাওয়া যায়, যাঁদের শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাতমাস বয়সে পরীক্ষা করে দেখা হয়।

শিশুদের বুদ্ধিমত্তা নিরুপণের জন্যে 'সাপোর্ট' এবং 'কভার' নামক সমস্যা সমাধানের দু'টি টেস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। 'সাপোর্ট টেস্ট' পদ্ধতিতে একটি শিশুর সামনে টেবিলের ওপর লম্বা একখানি কাপড় রাখা হয়, এরপর শিশুর নাগালের বাইরে কাপড়ের শেষপ্রান্তে একটি খেলনা রাখা হয়। এই পরীক্ষায় খেলনাটি পেতে হলে শিশুকে কাপড়খানি টেনে কাছে এনে খেলনাটি নিতে হবে। 'কভার

টেস্ট' পদ্ধতিতে শিশুর সামনে একটি খেলনা একখণ্ড কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এই পরীক্ষায় খেলনাটি পেতে হলে শিশুকে কাপড়খণ্ড সরিয়ে খেলনাটি বের করে নিতে হবে। সম্পূর্ণ পরীক্ষাগুলো ভিডিও করে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে তা দেখে শিশুর বিভিন্ন আচরণের ওপর নম্বর দেওয়া হয়। সমস্যা সমাধানের দুটি টেস্টই চারবার করে করতে বলা হয়। প্রত্যেকবার তিনটি আচরণের ওপর নম্বর দেওয়া হয়। সেগুলো হলো, কাপড় ধরার আচরণ (শিশু যেভাবে কাপড়টি টানে বা তুলে), দৃষ্টি-আচরণ (যেভাবে শিশু খেলনাটির দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে) এবং খেলনা-আচরণ (যেভাবে শিশু খেলনাটি করায়ত্ব করে)। প্রত্যেকটি আচরণের ওপর তিনটি ভিন্ন নম্বর ধার্য করা হয় – কোনো আগ্রহ না দেখালে 'শূন্য', সম্ভাব্য বা দ্বিধান্বিত আগ্রহের জন্য 'এক' এবং খেলনাটি নেওয়ার পরিষ্কার আগ্রহ দেখলে 'দুই' নম্বর দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি আচরণের ওপর প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে একটি 'আগ্রহের-নম্বর' (ইন্টেনশন স্কোর) দেওয়া হয়। এভাবে প্রতি পরীক্ষায় নম্বরের মাত্রা ছিলো শূন্য থেকে ছয় পর্যন্ত এবং চারটি পরীক্ষার মোট নম্বরের মাত্রা (রেঞ্জ) হয় '০' থেকে '২৪'।

সাইকোমটর দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য 'বেইলি স্কেলস অব ইনফ্যান্ট ডেভেলপমেন্ট' নামক একটি শিশু বিকাশ স্কেলের দ্বিতীয় সংস্করণের 'সাইকোমটর ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (পিডিআই)' ব্যবহার করা হয়। এগুলো ভাষার প্রভাবমুক্ত এবং সংস্কৃতিগতভাবে পরিমার্জিত সহজ পরীক্ষা যা শিশু গর্ভে থাকাকালীন সময়ে কোনো সমস্যার কারণে পরবর্তীতে অস্বাভাবিক আচার-আচরণ করলেও তার প্রাথমিক লক্ষণগুলো ধরতে সক্ষম। সমস্যা-সমাধানের এই টেস্টসমূহ ব্যবহার করার কারণ হলো, এর দ্বারা সূক্ষ্ম পার্থক্য নিরুপণ করা যায়, এই টেস্টগুলো তুলনামূলকভাবে সহজ এবং ভিডিওটেপের মাধ্যমে এই টেস্টসমূহের ফলাফল নিরুপণ করা হয় বলে টেস্টসমূহের চলমান গুণগতমান নিয়ন্ত্রিত থাকে। মা ও শিশুর সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা, তাদের দৈহিক অবস্থা, দেহের ওজন (অ্যানথ্রোপোমেট্রিক অবস্থা) ইত্যাদি তথ্যাবলি মিনিম্যাট গবেষণায় বিস্তারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে পূর্বেই সংগৃহীত ছিলো। পানির আর্সেনিকের মাত্রাকে প্রতি লিটারে ১০ মাইক্রোগ্রামের কম, ১০-৫০ মাইক্রোগ্রাম এবং ৫০ মাইক্রোগ্রামের বেশি, এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেও এনালাইসিস অব ভ্যারিয়েন্স-এ (এএনওভিএ) বিশ্লেষণ করা হয়েছিলো।

যেসব শিশুর মায়েরা প্রতি লিটারে ৫০ মাইক্রোগ্রামের বেশি আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করেছিলেন তাদের বুদ্ধির বিকাশ, যাদের মায়েরা কম আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করেছিলেন তাদের শিশুদের থেকে সামান্য কম ছিলো (সারণি ১)। পানিতে আর্সেনিকের মাত্রাকে একটি চলতি ভ্যারিয়েবল হিসেবে ধরে নিয়ে এবং অন্যসব সামাজিক-জনমিতিক তথ্যগুলোকে কো-ভ্যারিয়েট হিসেবে ধরে নিয়েও দেখা যায় যে, সমস্যা-সমাধানের জন্য ব্যবহৃত 'সাপোর্ট' এবং 'কভার' উভয় টেস্টেই আর্সেনিকের ক্ষতিকর ফলাফল তৎপর্যপূর্ণ ছিলো (সাপোর্ট: বি ± এসই: -০.০০৩ ±০.০০১, পি=০.০০৮ এবং কভার: -০.০০২ ±০.০০১, পি=০.০৩৫)। আর্সেনিকের মাত্রা কম থেকে বেশি হওয়ার সাথে সাথে বুদ্ধির বিকাশও বেশি থেকে কমে যাওয়ার এই নিম্নগামী প্রবণতা সাপোর্ট (পি <০.০০২) এবং কভার উভয় পরীক্ষাতেই (পি <০.০০৭) দেখা গেছে। সাইকোমটর ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সে আর্সেনিকের তেমন উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখা যায় নি (বি±এসই: -০.০০৩±০.০০২, পি=০.১৯৯)।

সারণি ১: গর্ভকালীন সময়ে আর্সেনিক-আক্রান্ত তিনটি শ্রেণীর বুদ্ধিমত্তা ও সাইকোমটর বিকাশের গড় (স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা এসডি)

আর্সেনিকের মাত্রা মাইক্রোগ্রাম/লিটার	সংখ্যা	মোট কভার গড় ±এসডি*	মোট সাপোর্ট গড় ±এসডি*	সাইকোমটর ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স-গড় ±এসডি
০.৫-৯.৯৯	৫৩৮	১৩.৬±৬.৭	১২±৭.৫	১০৪.৪±১৫
১০-৪৯.৯৯	১৯০	১৩.৪±৬.৬	১১.৭±৭.৩	১০৪.২±১৬
≤৫০	৮৩৪	১২.৬±৭.১	১০.৬±৭.৬	১০৩±১৬
মোট	**১,৫৬২**	**১৩.০৬±৬.৯**	**১১.২±৭.৬**	**১০৩.৬±১৫**
গ্রুপ ডিফারেন্স পি ভ্যালু		০.০১৭	০.০০২	০.৩৬

এএনওভিএ-তে কভার টেস্ট ও পিডিআই-এ বয়স এবং সাপোর্ট টেস্টে বয়স ও লিঙ্গ কন্ট্রোল করা হয়েছে

প্রতিবেদক: ক্লিনিক্যাল সায়েন্সেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: আইসিডিডিআর,বি, ইউনিসেফ, সিডা-এসএআরইসি, ইউকে মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল, সুইডিস রিসার্চ কাউন্সিল, ডিএফআইডি, সিএইচএনআরআই, উপসালা ইউনিভারসিটি এবং ইউএসএআইডি

মন্তব্য

সাতমাস-বয়সী শিশুদের ওপর তাদের মায়েদের গর্ভকালীন সময়ের আর্সেনিকের প্রভাব নিরুপণে যে বুদ্ধিমত্তার (সমস্যা সমাধানের) পরীক্ষা করা হয়েছে তাতে কিছুটা নেতিবাচক (নেগেটিভ) ফল পাওয়া গেছে। যেসব মায়েরা গর্ভাবস্থায় উচ্চহারে আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করেছেন তাঁদের শিশুদের সাইকোমটর ডেভেলপমেন্টও কম হওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে, তবে এই ব্যবধান পরিসংখ্যানিকভাবে তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

আলোচ্য গবেষণায় যেসব শিশুর বুদ্ধিমত্তা ও সাইকোমটর বিকাশের ফলাফল পরিমাপ করা হয়েছিলো তারা ছিলো খুবই ছোট (সাতমাস-বয়সী) এবং তাদের ৬৫%-কে ছয়মাস পর্যন্ত প্রধানত মায়ের দুধ দেওয়া হয়েছিলো (মিনিম্যাট গবেষণার ড. ইকবাল কবিরের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ)। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত মতলবে শিশুদেরকে শুধুমাত্র মায়ের দুধ দেওয়ার মিডিয়ান সময়সীমা (মিডিয়ান ডিউরেশন) প্রায় ছয়মাসের কাছাকাছি ছিলো (১৪)। পূর্ববর্তী গবেষণা (১৪) এবং অন্যান্য জাতীয় পর্যায়ের পরিসংখ্যানের তুলনায় এই গবেষণায় ছয়মাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের প্রধানত মায়ের দুধ দেওয়ার হার বেশি দেখা গেছে। এর কারণ হলো, মিনিম্যাটের প্রধান গবেষণার একটি ইন্টারভেনশন কর্মসূচি ছিলো শিশুদেরকে প্রথম ছয়মাস শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর পরামর্শ দেওয়ার ওপর। বুকের দুধ থেকে খুব স্বল্প পরিমাণে আর্সেনিক

নির্গত হয় (৭), এবং যাঁরা আংশিকভাবে বুকের দুধ খাওয়ান, তাঁদের শিশুদের ক্ষেত্রেও অন্যান্য খাবার বা পানীয় থেকে আর্সেনিকে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এছাড়া এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব প্রকাশ পেতেও কয়েকমাস সময় লাগে। সুতরাং, এ-গবেষণায় শিশুদের মধ্যে আর্সেনিকের যে প্রভাব দেখা গেছে, তা সম্ভবত গর্ভে থাকাকালীন সময়ে মায়ের জরায়ুর মধ্য দিয়ে তাদের শরীরে আর্সেনিক পরিবাহিত হওয়ার কারণেই হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে আর্সেনিক ধীরে ধীরে কী উপায়ে মস্তিষ্কে (ব্রেন) প্রভাব ফেলে তা খুব পরিষ্কার নয়। কোষের সাথে আর্সেনিকের সংযুক্ত হয়ে থাকার কারণেও দেহে এর জৈবিক প্রভাব পড়তে পারে (১৫)। মস্তিষ্কে কখনো কখনো বাহ্যিক গঠনগত কোনো সমস্যা না থাকলেও এর কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। পশুর মধ্যে দেখা গেছে, আর্সেনিকে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তার মস্তিষ্কের এনজাইমের কার্যকারিতা পরিবর্তিত হয়ে যায় (৮,৯)। গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত গর্ভবতী ইঁদুরগুলোকে আর্সেনিকমিশ্রিত পানীয় দিয়ে দেখা গেছে যে, এর ফলে তাদের স্বাচ্ছন্দ্য গতিবিধি কমে গেছে এবং ইঁদুর ছানাগুলো এক ধরনের বিশেষ শিক্ষামূলক কাজে (স্পেসাল লার্নিং টাস্ক) অস্বাভাবিক আচরণ করেছে (১৬)। পশুর ওপর পরিচালিত কিছু গবেষণা থেকে জানা যায় যে, আর্সেনিকের প্রভাবে পশুর মস্তিষ্কে এক ধরনের অক্সিডেটিভ চাপ পড়ে (১৭)।

একটি গবেষণা থেকে জানা যায় যে, গর্ভকালীন সময়ে মিথাইলেশন বৃদ্ধি পায় এবং এটি বাড়ন্ত ভ্রূণকে কোনো ধরনের ক্ষতির হাত থেকে নিরাপদ রাখে (৭,১৮), অথচ এ-গবেষণায় মায়েরা গর্ভবর্তী থাকা সত্ত্বেও দেখা গেছে যে, আর্সেনিক গর্ভজাত শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কিছু ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। পার্থক্যটি খুব কম হলেও এর পরিসংখ্যানগত তাৎপর্য রয়েছে। পরবর্তীতে এই ক্ষতিকর প্রভাব কার্যত কী ধরনের সমস্যা করবে তা বলা যায় না, তবে এটি একটি উদ্বেগের বিষয়। এ-গবেষণাটি ছিলো খাদ্য ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের ওপর পরিচালিত কমিউনিটি-নির্ভর একটি বড় ধরনের ইন্টারভেনশনের অংশ এবং সব গর্ভবতী মাকে সম্পুরক খাদ্য হিসেবে ফলিক এসিডের মতো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট দেওয়া হয়েছে, যা আর্সেনিকের ফলে যে অক্সিডেটিভ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। এছাড়া এটি জানা যায় নি যে, গর্ভধারণের কোন পর্যায়ে মায়েরা তাঁদের নলকূপের পানিতে উচ্চমাত্রায় আর্সেনিকের কথা জানতে পেরেছেন এবং এটি জানার পর তাঁরা অন্য কোনো উৎসস্থল থেকে কম আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করেছেন কি না। হতে পারে যে, এই গবেষণায় মায়েদের অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট খাওয়ার ফলে এবং পানির উৎসস্থল পরিবর্তনের ফলে (যদি করে থাকেন) ভ্রূণের মস্তিষ্ক বিকাশে আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব কিছুটা কম হয়েছে, যার ফলে আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব (ইফেক্ট সাইজ) খুব সামান্যই দেখা গেছে।

এটি একটি বড় ধরনের দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা এবং গবেষণার আওতাধীন এই শিশুদের পরবর্তী বিকাশও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এর ফলে জরায়ুর মধ্যে থাকাকালীন সময়ে শিশুদের ওপর আর্সেনিকের প্রভাব থাকলে তার দীর্ঘমেয়াদী কোনো ফল আছে কি না এবং সরাসরি আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করার ফলে তাদের বর্তমান বিকাশে আর্সেনিকের কোনো প্রভাব পড়ছে কি না সেসম্পর্কেও পরবর্তীতে জানানো যাবে। শিশুদের সমস্যা সমাধানের পরীক্ষায় যে ফল পাওয়া গেছে

তা সামান্য নেতিবাচক, হলেও উদ্বেগজনক। যদিও এই ঘাটতি ক্লিনিক্যালি কতটা গুরুত্ব বহন করে এবং এর ভবিষ্যৎ প্রভাব কী তা এখনো জানা যায় নি, তবে আর্সেনিকের প্রভাব দমনের পক্ষে এ-গবেষণা আরো সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করেছে।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা'র প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত সার্ভিলেন্স-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাগাকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স কর্মসূচির তথ্যগুলো প্রতিফলিত হয়। আমরা আশা করছি, রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ-প্রতিরোধ সর্ম্পকে আগ্রহী স্বাস্থ্য গবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদনশীলতার অনুপাত: সেপ্টেম্বর ২০০৬-আগস্ট ২০০৭

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সংখ্যা = ১৫৭)	*ভি. কলেরি* ও১ (সংখ্যা = ৭৮৯)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	২৩.৬	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিনাম	৯৪.৯	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৫৫.৪	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	২৯.৯	০.৯
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৯৮.১	১০০.০
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	৬৩.২
ইরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	৯.৫
ফুরাজোলিডোন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.১

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি ও১, শিগেলা এবং রোটাভাইরাস-এর তুলনামূলক চিত্র: সেপ্টেম্বর ২০০৬-আগস্ট ২০০৭

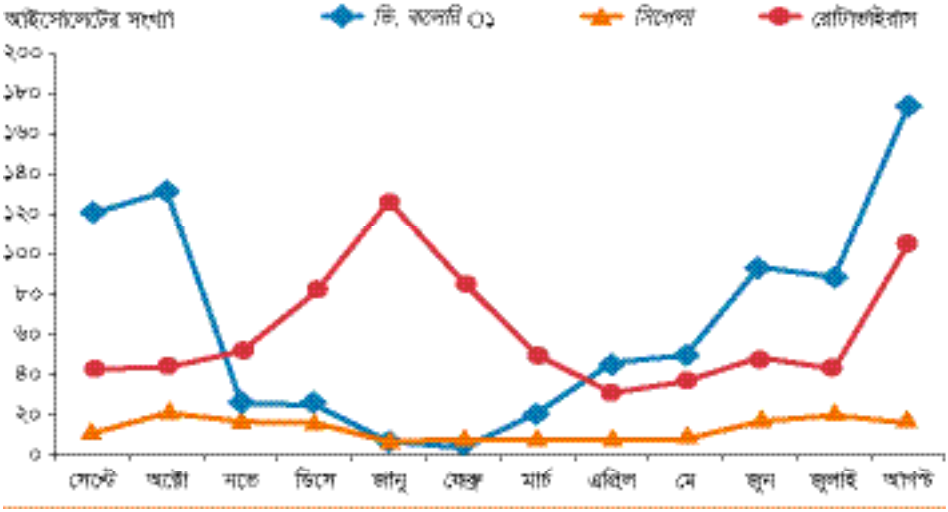

ওষুধের বিরুদ্ধে ১২৬টি এম. টিউবারকিউলোসিস জীবাণুর প্রতিরোধের ধরন: সেপ্টেম্বর ২০০৬-আগস্ট ২০০৭

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন		মোট
	প্রাইমারি (সংখ্যা=১১৫)	একোয়ার্ড* (সংখ্যা=১১)	(সংখ্যা=১২৬)
স্ট্রেপটোমাইসিন	৩২ (২৭.৮)	৪ (৩৬.৪)	৩৬ (২৮.৬)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	১২ (১০.৪)	৩ (২৭.৩)	১৫ (১১.৯)
ইথামবিউটাল	৩ (২.৬)	২ (১৮.২)	৫ (৪.০)
রিফামপিসিন	৬ (৫.২)	২ (১৮.২)	৮ (৬.৩)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	৩ (২.৬)	২ (১৮.২)	৫ (৪.০)
অন্যান্য ওষুধ	৩৫ (৩০.৪)	৪ (৩৬.৪)	৩৯ (৩১.০)

() শতকরা হার * একমাস বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে স্ট্রেপটোকোক্কাস নিউমোনি জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: এপ্রিল-জুন ২০০৭

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীলতা* সংখ্যা (%)	রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা* সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	২৩	২৩ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	২৩	৬ (২৬.০)	০ (০.০)	১৭ (৭৪.০)
ক্লোরামফেনিকল	২৩	২০ (৮৭.০)	০ (০.০)	৩ (১৩.০)
সেফট্রিয়াক্সোন	২৩	২৩ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	২৩	২০ (৮৭.০)	০ (০.০)	৩ (১৩.০)
জেন্টামাইসিন	২৩	৩ (১৩.০)	০ (০.০)	২০ (৮৭.০)
অক্সাসিলিন	২৩	২২ (৯৬.০)	১ (৪.০)	০ (০.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি এবং শিশু হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; আইসিএইচ-শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল; কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর এবং আইসিডিডিআর,বিকর্তৃক ঢাকার কমলাপুর (শহরাঞ্চল) এবং টাঙ্গাইলের মির্জাপুর (গ্রামীণ) এলাকায় পরিচালিত নিউমোএডিআইপি সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী শিশুদের থেকে সংগৃহীত।

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এস. টাইফি জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: এপ্রিল-জুন ২০০৭

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীলতা সংখ্যা (%)	রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	৩৫	১৮ (৫১.০)	০ (০.০)	১৭ (৪৯.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	৩৫	১৮ (৫১.০)	০ (০.০)	১৭ (৪৯.০)
ক্লোরামফেনিকল	৩৫	১৮ (৫১.০)	০ (০.০)	১৭ (৪৯.০)
সেফট্রিয়াক্সোন	৩৫	৩৫ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৩৫	৩৪ (৯৭.০)	০ (০.০)	১ (৩.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি এবং শিশু হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; আইসিএইচ-শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল; কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর।

ঢাকা হাসপাতালের তাঁবুতে ডায়রিয়া রোগীদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে, আগস্ট ২০০৭ (সৌজন্যে: ফখরুল আলম)

আইসিডিডিআর,বি এবং এর যেসব দাতা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে এর পরিচালনা এবং গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করছে তাদের অর্থানুকুল্যে স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা-র এ-সংখ্যাটি ছাপা হচ্ছে। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যারা অর্থ সাহায্য করছে তারা হলো: অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (অসএইড), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), সৌদি আরব, নেদারল্যান্ডস, শ্রীলঙ্কা, সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ এজেন্সি (সিডা), সুইস ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), ইউকে। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এসব দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সহায়তা এবং প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করছি।

আইসিডিডিআর,বি
জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org/hsb

সম্পাদকমণ্ডলি:
স্টিফেন পি লুবি
পিটার থর্প
এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা

সম্পাদনা বোর্ড:
চার্লস পি লারসন
এমিলি এস গারলি

যাঁরা লেখা দিয়েছেন:
এমিলি এস গারলি
এসএ সাহেদ হোসেন
ফাহমিদা তোফায়েল, জেনা ডি হামাদানি
এবং এম. হাকিম

কপি সম্পাদনা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা:
এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা

বাংলা অনুবাদ:
এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা

ডিজাইন এবং প্রি-প্রেস প্রসেসিং:
মাহবুব-উল-আলম